# একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)

**An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)**

## Nalini Bera's short stories: Diary of Dalit life

## নলিনী বেরার ছোটগল্প: দলিত জীবনের রোজনামচা

Name of the Author: Mousumi Mukherjee
Affiliation: Ph.D Research Scholar, Bengali Department
The Sanskrit College And University
Kolkata, West Bengal, India

**Abstract:** In our society, the Dalit problem is a major issue even today. We can trace this discrimination back to the time when Charyapada was written. Based on economic status, the elite class has created a distance between themselves and people of lower classes. In our modern generation, even though our Constitution states that everybody is equal, we still witness discrimination.

We refer to those people as Dalits or Harijans who lack economic stability. In modern Bengali literature, the writer Nalini Bera has written many stories and novels based on their real lifestyle. In his short stories, he portrays their habits, rituals, occupations, socio-economic conditions, and the experiences and struggles of women. In this essay, I will discuss the short stories of Nalini Bera based on Dalit lifestyle.

**Key words:** Dalit life, discrimination, Dalit language, myth, socio–economic position

# নলিনী বেরার ছোটগল্প: দলিত জীবনের রোজনামচা

মৌসুমী মুখার্জী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দলিত জীবনের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। প্রাচীন চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্যচর্চায়ও দলিত প্রসঙ্গ সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। 'দলিত' কথার অর্থ যাকে দলন করা হয়। সমাজে অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা বিত্তশালী তারা বরাবর অর্থহীন দরিদ্র মানুষের ওপর দমন পীড়ন চালিয়ে এসেছে এবং চালাচ্ছে। প্রধানত অর্থনৈতিক দিক থেকে পার্থক্যকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজে উঁচু নিচু জাতের মধ্যে শ্রেণিবিভাজন করা হয়ে এসেছে। চর্যাপদের কবিরা দেখিয়েছেন নিম্নবর্গের মানুষেরা শহরের বাইরে বসবাস করেছে। চর্যাপদে উল্লেখ রয়েছে, " নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া।"[১] অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই সেই সময় জীবিকার ভিত্তিতে জাতের বিচার হতো এবং নিম্নবর্গীয়রা সমাজে উচ্চবর্ণের মানুষের সঙ্গে একসাথে থাকার সুযোগ কখনোই পেত না।

বাংলা সাহিত্যে দলিত জীবনের কথা বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী দলিত মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের জীবনের উপাখ্যান তুলে ধরেছিলেন তাঁর বিভিন্ন রচনায় এবং সাহিত্য কর্মে। পরবর্তী সময়ে সেই ধারা বহন করেছেন আধুনিক যুগের দলিত দরদী সাহিত্যিক নলিনী বেরা। খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের ভাষা, তাদের জন্মস্থান, তাদের রীতিনীতি, প্রথা, নারীদের অবস্থান, তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি সবকিছুর প্রতি লেখক গভীরভাবে আকর্ষণ অনুভব করেছেন।নিম্নবর্গের পিছিয়ে পড়া মানুষদের কখনো দলিত, কখনো হরিজন ইত্যাদি বিভিন্ন আখ্যায় মানুষ ভূষিত করে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই তাদের সমস্যার সমাধানের বিষয়ে ওয়াকিবহাল নয়। লেখক নলিনী বেরা তাঁর লেখা ছোটগল্পে নিচুশ্রেণির মানুষের যে আখ্যান তুলে ধরে আধুনিক পাঠককে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা থাকবে আমার এই প্রবন্ধে। লেখকের রচনাকে অবলম্বন করে দলিত জীবনের সামাজিক বৈষম্য, প্রতিনিয়ত টিকে থাকার জন্য তাদের যে লড়াই, পেটভাতের তাগিদে সমাজের মানুষের চোখে যেসব কাজগুলি নিচু অনবরত সেগুলি করে চলা, ইত্যাদি সবকিছুর বিস্তারিত আলোচনা করার প্রচেষ্টা থাকবে আমার এই রচনাটিতে।

শহরের মানুষের কাছে অজ্ঞাত আমাদের গ্রাম বাংলার বিভিন্ন গ্রাম এবং সেই সব গ্রামে বসবাসকারী নিম্নবর্গের মানুষের জীবনের আলোচনা আমরা পাই নলিনী বেরার ছোটগল্পে। লেখকের রচনায় উঠে আসা গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এইসব অজানা গ্রামের একটি তালিকা দেওয়ার চেষ্টা করব, যেমন -
ঝাড়গ্রাম মহকুমার নয়াগ্রাম থানার মলতাবনী - তালডাংরা- উপর পাতিনা - নামো পাতিনা - দেউলবাড় - খান্দার পাড়া- বড়ডাঙ্গা- থুরিয়া, ঘোড়াটাপুর, তপোবন, বড়খাঁকড়ি ,পাঁচকাহিনা, দোলগ্রাম, খড়িকামাথানী, বাছুর খোঁয়াড় ইত্যাদি। সাধারণ মানুষের অজানা, অচেনা গ্রাম এবং সেই সব গ্রামের নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত নানা বাস্তব কাহিনীকে লেখক ছোট গল্পের আবরণে পাঠকের সামনে তুলে ধরার নিরলস প্রচেষ্টা করেছেন।

অর্থসংস্থানকে কেন্দ্র করে বহুকাল ধরেই উচ্চ নিচের প্রভেদ আরো প্রকট হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজে।দলিত শ্রেণীর মানুষেরা ভিন্ন ভিন্ন জীবিকাকে অবলম্বন করে নিজেদের রুটি রোজগারের ব্যবস্থা করে থাকেন। সমাজে তথাকথিত যেসব কাজগুলিকে আমরা নিচু নজরে দেখে থাকি। সেই সব কাজগুলি এইসব মানুষের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। নলিনী বেরার ছোটগল্প থেকে আমরা সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষের দ্বারা চালিত এমন কিছু জীবিকার প্রসঙ্গ তুলে ধরবো যা তথাকথিত শিক্ষিত শহুরে মানুষের অজানা।যেমন -

১/ " হাতীবান্দীর কালু ডোম নিতাই ডোমরা এখন আর ঢোল বাজায় না। রিকশা চালায়।"[২] (বর্ষামঙ্গল)

২/ "সরিন্দর খালেবিলে নদীতে চানাচুনো, 'সতীবাঁধা', মাছ ধরে। আশেপাশের গ্রামে, গুরুবারের হাটে খলুই উপর করে তা বেচে দেয়। কংসহরিও মাছ ধরে মাছ বেঁচে, সময় সময় সজনের ডাঁটা নিয়েও সে হাটে যায়।"[৩] (ভূতজ্যোৎস্না)

৩/ "ডুমুরবাঁধ, জোড়াবাঁধের ভূমিহীন দরিদ্র সাঁওতাল কামিন মুনিশরা জন খাটতে হই হই করে আমডহরার খেতে - খামারে নেমে পড়ছে।"[৪] (ঘবা তিহা-র গল্প)

৪/ " 'কাজ' বলতে ছোট ছোট পাঁঠা-বাচ্চার অন্ডকোষ কেটে ' খাসি' করা।"[৫] (ভূত জ্যোৎস্না)

এভাবেই দরিদ্র নিম্নবর্গের মানুষেরা বিভিন্ন ঋতুতে কষ্ট সহ্য করেও খাদ্য শস্য উৎপাদনে কখনো, বা যানবাহন চলাচলের কাজে সহায়তা করে আমাদের জীবনকে সচল রাখতে উদ্যোগী হয়।

চর্যাপদ পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই এই দরিদ্র শ্রেণির মানুষেরা নেশার দ্রব্য, বিভিন্ন পানীয় বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। ঠিক তেমনভাবেই এই নিম্নবর্গীয় মানুষেরা আজও বিভিন্ন নেশার পানীয় বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে চলেছে। নলিনী বেরার 'শকুনির পাশা' গল্পে লেখক বলেন, জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে ঝকঝকে অ্যালুমিনিয়ামের হাড়িতে মদ হাঁড়িয়া নিয়ে সাঁওতাল বধূরা খদ্দেরের অপেক্ষায় বসে আছে। যুগের পরিবর্তন হলেও এইসব মানুষদের জীবিকার পরিবর্তন তেমনভাবে লক্ষিত হয় না।

নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মধ্যে শিক্ষার আলো আজও অনেক অংশেই অধরা। তাই তাদের মধ্যে কুসংস্কার, দৈত্যদানোর প্রতি বিশ্বাস অটল। জলপড়া, নজরলাগা, বাটিচালানো ইত্যাদি নানারকম ভাগ্যান্বেষণের কাজে তারা আজও গুনিণকে ডাকে। নলিনী বেরার 'ভুতের চারা' গল্পে লেখক বলেন বালক মুর্মু গুনিনের,

" যুগনী কালামুখী কুদ্রা ধনকুদ্রা সোনামুখী কুদ্রা চিড়কিন্ প্রেতসিনি কালপুরুষা বাঘুৎ গোমুহাভূত ডাইনিভূত- কত রকম ভূতই যে তার পোষা ছিল!"[৬] (ভূত চারা)

এই সব দলিত শ্রেণির মানুষেরা চুন তৈরি করাকেও তাদের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। 'অপারেশন পাঁচকাহিনা' গল্পে লেখক দেখান যমুনাবতী নামক এক নারী খাল বিলের ঝিনুক পুড়িয়ে কলিচুন তৈরি করে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করে। এটি তার পেশা। এইসব মানুষেরা শিক্ষার আলোক স্পর্শ থেকে বহু দূরে বিরাজ করলেও শিক্ষা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব এরাই কাঁধে তুলে নেয়। লেখকের 'ঝাঁটার কাঠি' গল্পে দেখা যায় সুনি সাঁওতাল এবং তার পরিবারের লোকজনরা সরস্বতী পূজার আগে কেঁচো মাটি জলে গুলে ন্যাতা বুলিয়ে স্কুল ঘরের মাটির দেয়াল পরিষ্কার করে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমাদের সমাজের চালিকাশক্তি হিসাবে এইসব মানুষের শ্রম আমাদের মানবজীবনকে সচল রেখেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসে কথক সুচাঁদের মুখে আমরা একটি জনজাতির বিবর্তনের ধারা, তাদের প্রচলিত সমাজের মিথ সম্বন্ধে জানতে পারি। নিম্নবর্গের মানুষের এই মিথের প্রসঙ্গ নলিনী বেরার গল্পে বারবার এসেছে। তাঁর 'ঘবা তিহা-র গল্প' রচনায় তেমনই একজন কথক হলেন পিতাম হাঁসদা। তার মৃত্যু প্রসঙ্গে লেখক বলেন,

" তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালপাড়ায় গুতিকোড়া আর কাড়মিকুড়ির 'কাহিনি' ও শেষ হয়েছে"।[৭]

মানব ইতিহাস আবহমান কাল ধরেই গতিময়। প্রতিটা অধ্যায়েরই সমাপ্তি রয়েছে। কোন এক জনজাতির প্রাচীন মানুষটির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই জনজাতির প্রাচীনত্ব শেষ হয়ে নতুনের শুভ সূচনা হয়। লেখকের 'বর্ষামঙ্গল' গল্পে তিনি বলেন সাঁওতাল পরগনায় এক মিথের প্রচলন রয়েছে। তিনজন বেটে মানুষ রাতের বেলায় হেঁটে যায়।

"যেতে যেতে তারা যদি কারোর উঠোনে দাঁড়িয়ে তিন তিনবার নাম ধরে হাঁকে,"[৮]

যার নাম ধরে ডাকা হয় রাত পোহালে তার নিশ্চিত মৃত্যু হয়। 'গ্রামের চিঠি' গল্পে লেখক বলেন বট আর অশ্বত্থ গাছ পাশাপাশি থাকলে অবশ্যই তাদের বিবাহ দিতে হয় তা না হলে তারা বাঁচে না। সাঁওতাল জনজাতির মধ্যে এক ধরনের রীতি প্রচলিত ছিল, কোন সাঁওতাল পরিবারে অতিরিক্ত সুন্দরী বউ এলে তারা ঝাঁটার কাঠি ছুঁইয়ে দেখে, মেয়েটি মানবী কিনা। 'ঝাঁটার কাঠি' গল্পে লেখক এই প্রসঙ্গ এনেছেন কাহিনিতে। দলিত মানুষদের মধ্যে নানা মিথ যেমন রয়েছে তেমনি তাদেরকে ঘিরে সভ্য সমাজের মানুষের মধ্যেও নানা চাঞ্চল্যকর ধ্যান-ধারণা গ্রথিত রয়েছে। সাঁওতাল পরগনা থেকে আগত কোন মানুষকে দেখলেই সভ্য সমাজের মানুষরা তাকে অত্যন্ত সহজে মাওবাদী তকমা দিয়ে চিহ্নিত করে। 'মাও ও মার্ডারার' গল্পে গুজরিকে যখন পাওয়া যায়নি তখন রত্না বলল,

"কাজের লোকেদের কাছে সে ওই সমস্ত বলে বেড়াতো। নাকি এ. কে. ফরটি সেভেন নিয়ে মাওয়েরা আগেভাগে গ্রামে গ্রামে নোটিশ দিয়ে যেত যে, আজ রাতে জঙ্গলে মিটিং আছে। সেই জঙ্গল মিটিং-এ গুজরিরা দল বেঁধে-"[৯]

শহরের মানুষেরা দলিত মানুষের জীবন বিষয়ে আদৌ ওয়াকিবহাল নয়। তা সত্ত্বেও ওইসব দলিত মানুষকে খারাপ বলে দাগিয়ে দেওয়ার যে প্রবণতা আধুনিক সমাজে আমরা দেখতে পাই, তা আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুপ্ত বর্ণবৈষম্যকেই ইঙ্গিত করে।

এইসব মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রীতিনীতি, পুজো-পার্বণের প্রচলন অনেক বেশি মাত্রায় বর্তমানেও রয়ে গেছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় নলিনী বেরার বেশ কিছু গল্পে, যেমন-

১/ "গামছা পড়ে লাঙ্গলটা গোবরগাদায় একবারটি পুঁতে দিয়ে আয় ধন। না হলে এই বর্ষায় ঘরদোর সব ভেসে যাবে বাপ আমার।" [১০](বর্ষামঙ্গল)

২/ "কবরস্থানে ধারে বসে জাদু-হাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গুনিন সেই সদ্য মরা মানুষের আত্মাকে ডাকে, বলে, 'বেরিয়ে এসো'। একসময় সে বেরিয়ে আসে সত্যি সত্যি। সে সময় সে খুব ক্ষুধার্ত থাকে, খেতে চায়

নাকি সুরে 'খেঁতে দেঁ খেঁতে দেঁ!' গুনিন তাকে খেতে দেয় উইঢিবির মাটি, আমলকি গাছের পাতা।"[১১] (ভূতের চারা)

৩/ "সাঁওতালটোলার মানুষ মানে ব্ল্যাক ম্যাজিক। জিন, ডাইনী, ভূতপ্রেত, হুজুক,বুজরুকি। সেসব নিয়ে জরপ হয়।"[১২] (জুনেইদদের গ্রাম)

৪/ "সান্তালটোলীতে বারো মাসে তেরো পার্বণ"[১৩] (জুনেইদদের গ্রাম) ইত্যাদি নানান রীতি- নীতি, পূজো-পার্বণ নিয়ে নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতি আধুনিক যুগেও সমানভাবে বিদ্যমান।

আধুনিক তথাকথিত উচ্চবর্গীয় মানুষ যেমন আজও নিম্নবর্গীয় মানুষদের থেকে নিজেদেরকে সচেতন ভাবে দূরে সরিয়ে রাখে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠিক তেমনভাবেই নিম্নবর্গের এইসব দরিদ্র মানুষেরা শিক্ষিত শহুরে আদব কায়দা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে সদা সচেষ্ট। নলিনী বেরার 'গ্রামের চিঠি' গল্পে গ্রামের স্কুলে আগত নব্যশিক্ষিকা মিস আরতীকে গন্ডগ্রামের মানুষ নিজের করে নিতে পারেনি এবং শিক্ষিকাও তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে অক্ষম। নিচুশ্রেণির মানুষেরা সর্বদাই ধনীশ্রেণির সেবায় নিজেদের নিযুক্ত রাখলেও উচ্চবিত্ত শ্রেণি সবসময় বৈষম্যকে প্রাধান্য দিয়ে চলে। 'ঘবা তিহা-র গল্প' রচনায় ধনীশ্রেণির প্রতিনিধি সর্বেশ্বর সাঁপুই বলে,

"ঝরনাতলার কাছের জমিটা এদিক দিয়ে উৎকৃষ্ট। কিন্তু তাতে প্রত্যাহ কিছু নিকৃষ্ট জাতের স্ত্রীলোক স্নানাদি সেরে সর্বক্ষণ জল ঘোলা ও অপবিত্র রাখে।"[১৪]

প্রকৃতির দান জলকেও ধনীশ্রেণির মানুষ শ্রেণিবৈষম্যের জাঁতাকলে ফেলে, যার শিকার হয় এইসব দলিত শ্রেণির শ্রমজীবী মানুষেরা। ধনী শ্রেণির মানুষের মধ্যে জাতপাতের বিভাজন থাকলেও নিচু শ্রেণির মানুষ কখনোই এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। 'জুনেইদদের গ্রাম' গল্পে তাই লেখক বলেন,

" হিঁদুদের গোরুমোষ মুসলমানদের গোরুমোষ বলে এখানে আলাদা কিছু হয় না। গোরু গোরু, মোষ মোষ। মিলেমিশে একাকার সব।"[১৫]

শিক্ষিত মানুষের মধ্যে যে সম্প্রীতির অভাব দেখা যায় সেই সম্প্রীতির খোঁজ লেখক আমাদের দিয়েছেন দলিত শ্রেণীর মানুষকে চেনাবার মধ্যে দিয়ে। এইসব অতিদরিদ্র মানুষেরা তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা বার বার সরকারকে জানাতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। তাদের ভাষা সরকার অব্দি কখনোই পৌঁছাতে পারেনি। 'অপারেশন পাঁচকাহিনা' গল্পে তাই লেখক বলেন,

"সাদা পাতার সাদা অক্ষরও যদি পড়তে না পারে তবে আর কিসের সরকার? কিসের বাহাদুর?"[১৬]

আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে শিশুসন্তান জন্ম হওয়ার পর পিতার পরিচয়ই সন্তানের পরিচয় হয়। 'জলের মানুষ ডাঙারর মানুষ' গল্পে ঝরনা মালো নিজের শিশু সন্তানের অভিভাবকত্বের দাবি চেয়ে রেশনকার্ড থেকে পিতার নাম মুছে দিতে বলে। সমাজ এইসব মানুষদের দলিত বলে চিহ্নিত করে দিলেও তারা যে অনেক বেশি আধুনিক মনস্ক এই বিষয়টি বারবার লেখক পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে গেছেন তাঁর প্রতিটি গল্পে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের যৌন ইচ্ছা অনিচ্ছার গুরুত্ব দেওয়া হয় না। 'ঘবা তিহা-র গল্প' রচনায় ধনী মালিক শ্রেণীর প্রতিনিধি সর্বেশ্বর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার গোলায় কর্মরত সাঁওতাল রমণী রতনমণিকে ধর্ষণ করে। প্রত্যহ নারীরা এভাবেই নির্যাতিত হয়, তার এক আলেখ্য তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর এই গল্পে। তবে সাঁওতাল রমণী এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং প্রতিবাদ করেছে।

শহর থেকে যারা দূরে থাকে সেই সব মানুষদের অঞ্চলভেদে নির্দিষ্ট ভাষা রয়েছে। এইসব ভাষার শব্দগত , অর্থগত এক বিস্তৃত বৈচিত্র্য রয়েছে। দলিত ভাষার বৈচিত্র্য, অর্থগত সৌন্দর্য লেখক তাঁর সমস্ত ছোট গল্প জুড়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। উদাহরণের মাধ্যমে আমরা নিম্নবর্গীয় মানুষের সেই ভাষার কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করব।

মৌখিক ভাষায় শব্দগত পার্থক্য প্রধানত সব থেকে বেশি দেখতে পাওয়া যায়, যেমন-

১/ হেলে সাপ = হলহলিয়া সাপ

২/ হেলে সাপের মন্ড = গুড়ুপুটলু

৩/ চিলো = চিল

৪/ লদ্ধা = লোধা

৫/ কুরকুট পটম = ডিমওয়ালা লাল পিঁপড়ের পোঁটলা

৬ / শারজম গিরা = শাল গাছে ডাটিতে বেঁধে সিঁদুর লেপে মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা পাঠানো

৭/ ছেলে = টকা

৮/ ভাত = ভাতো

৯ / বেগুন = বাইগন

১০/ চোর = চুরো

১১/ ঘটি-বাটি = নুটা-তাটিয়া

১২/ কুকুর = কালামুখী কুদ্রা ইত্যাদি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দলিত প্রসঙ্গটি বর্তমানে অত্যন্ত বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সাহিত্যের বাজারের বহু লেখক এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে পাঠকের কাছে নিজেদের বাজারদর বাড়ানোর চেষ্টা করে চলেছেন অবিরত। দলিতদের প্রসঙ্গ তুলে ধরলেও সেইসব রচনায় যথাযথ দলিতজীবনের কথা থাকেনা। লেখক নলিনী বেরার 'জলের মানুষ ডাঙার মানুষ' গল্পে সুধন্য সরকারি অফিসে চাকরি করে এবং দলিত মানুষের জীবনকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করার চেষ্টা করে। লেখক সুধন্য চরিত্রটি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই বার্তাই দিয়েছেন যে কেবলমাত্র দলিতজীবনের তথ্য ক্রমানুযায়ী টুকে নিয়ে মর্মস্পর্শী লেখক হওয়া সম্ভব নয়। নিজেদের মুনাফা লাভের কথা ভাবতে গিয়ে দলিত বিষয়টিকে নিয়ে যে ব্যবসা তৈরি হয়েছে তার বিরোধিতা করেছেন লেখক। নলিনী বেরার গল্পে আমরা নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত চিত্রই পেয়ে থাকি। তাদের ভাষা, তাদের জীবনযাপন, বেঁচে থাকার জন্য ক্রমাগত যে লড়াই তার বাস্তব চিত্র পাই এই গল্পগুলোতে। যারা আধুনিক শিক্ষিত বলে নিজেদেরকে দাবি করেন তাদের থেকে এইসব নিম্নবর্গের

পিছিয়ে পড়া মানুষদের ভাবনাচিন্তা যে কোন অংশেই কম আধুনিকমনস্ক নয় এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন তিনি তাঁর গল্পে। শ্রেণিবৈষম্যের ধ্বজা তুলে আমরা যে বারবার আমাদের থেকে ওইসব মানুষদের পৃথক করছি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছেন লেখক এই গল্পগুলোকে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরে। সুতরাং বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক দিক বিচার করে এই কথা বলা যেতেই পারে নলিনী বেরার সাহিত্যকর্ম পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বিপুল তাৎপর্যে চর্চিত হওয়ার দাবি রাখে ।

**তথ্যসূত্র**

১/ দাস নির্মল দাস সম্পা চর্যাগীতি পরিক্রমা, ত্রয়োদশ সং ডিসেম্বর ২০১৮, দেজ পাবলিশিং , পৃষ্ঠা ১৪৩
২/ বেরা নলিনী , পঁচিশটি গল্প , প্রথম প্রকাশ ১৫ ই এপ্রিল ২০২৩,একুশ শতক, পৃষ্ঠা ১৭
৩/ তদেব, পৃষ্ঠা ৫৪
৪/ তদেব, পৃষ্ঠা ১১৫
৫/ তদেব, পৃষ্ঠা ৫৯
৬/ তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৩
৭/ তদেব, পৃষ্ঠা ১৩২
৮/ তদেব, পৃষ্ঠা ২০
৯/ তদেব, পৃষ্ঠা ২৭৯
১০/ তদেব, পৃষ্ঠা ২২
১১/ তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৪
১২/ তদেব, পৃষ্ঠা ২২৫
১৩/ তদেব, পৃষ্ঠা ২২৮
১৪/ তদেব, পৃষ্ঠা ১১৭
১৫/ তদেব, পৃষ্ঠা ২২৬
১৬/ তদেব, পৃষ্ঠা ২৫৩